২। সূরা আর-রাদ ১ম রুকু(১-৭ আয়াত)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ১ : ১৩

১. আলিফ লাম-মীম-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত, আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য; কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ঈমান আনে না।

এটাই এ সূরার ভূমিকা। এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে সমগ্র বক্তব্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যের লক্ষ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলছেনঃ হে নবী! তোমার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এ শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এটা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং লোকেরা মানুক বা না মানুক এটাই সত্য। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। তাতে অস্বীকারকারীদেরকে এ শিক্ষা সত্য কেন এবং এর ব্যাপারে তাদের নীতি কতটুকু ভুল-একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ভাষণটি বুঝতে হলে শুরুতেই এ বিষয়টি সামনে থাকা প্রয়োজন যে, নবী ﷺ সে সময় যে জিনিসটির দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা তিনটি মৌলিক বিষয় সমন্বিত ছিল।

এক, প্রভুত্বের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ কারণে তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত ও বন্দেগী লাভের যোগ্য নয়।

দুই, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আছে। সেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি করতে হবে।

তিন, আমি আল্লাহর রসূল এবং আমি যা কিছু পেশ করছি নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি।

এ তিনটি মৌলিক কথা মানতে লোকেরা অস্বীকার করছিল। এ কথাগুলোকেই এ ভাষণের মধ্যে বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ ও আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

আয়াতের প্রথমে "এগুলো কিতাবের আয়াত আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তা সত্য বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে দুটি মত রয়েছে।

এক. এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে, [তাবারী; বাগভী] আর তখন "আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে [তাবারী]

দুই. এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনুল করীম আল্লাহর কালাম এবং "আর যা আপনার রব এর পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআনে যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি নাযিল হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরুন। [বাগভী]

------অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,

"আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৩]

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ওর সঙ্গে তাঁর পক্ষ হতে এক সাক্ষীও বিদ্যমান, আর ওর পূর্বে (সাক্ষী) ছিল আদর্শ ও করুণা স্বরূপ মূসার গ্রন্থ; (সে কি তার মত যে অনুরূপ নয়)? এমন লোকেরাই এ (কুরআন)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর সমস্ত দলের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই (কুরআন) অমান্য করবে, তার প্রতিশ্রুত স্থান হবে জাহান্নাম। অতএব তুমি এ (কুরআন) সম্পর্কে সন্দেহে পড়ো না। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা সত্য (গ্রন্থ); কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। সূরা হুদঃ ১৭

অধিকাংশদের_ব্যাপারে_আল্লাহ্_বলেন:

"অধিকাংশই অজ্ঞ"

আর আমরা তাদের কাছে ফিরিশতা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে সমবেত করলেও আল্লাহর ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। [সূরা আনআম : ১১১]

"অধিকাংশই নির্বোধ" [সূরা মায়িদাহ ১০৩]

"অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবগত নয়" [সূরা ইউসুফ : ৬৮]

"অধিকাংশ লোকই অবগত নয়" [সূরা আনআম :৩৭]

"অধিকাংশই জানে না" [সূরা আরাফ : ১৩১]

"তুমি যতই প্রবল আগ্রহ ভরেই চাও না কেন, মানুষদের অধিকাংশই ঈমান আনবে না" [সূরা ইউসুফ :১০৩]

"আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না; বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না" [সূরা বাকারাহ: ৯৯-১০০]

"আমি তো তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী" [সূরা যুখরুফ :৭৮]

"তাদের অধিকাংশকেই আমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি, বরং অধিকাংশকে ফাসিকই পেয়েছি" [সূরা আরাফ : ১০২]

তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরন কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরন করে চলে; তারা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই করে না"[সূরা আনআম : ১১৬]

- অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।[সূরা ইউসুফ: ১০৬]

ধারনা কোন কাজে আসে না [সূরা ইউসুফ : ৩৬]

কথা হলো কেন অধিকাংশ লোক সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না ?

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা কয়েকটি কারণ বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

- আর তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজে আসে না । (সুরাঃ ইউনুস আয়াতঃ৩৬)
- তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক (সুরাঃ আল মায়িদাহ আয়াতঃ ৫৯)
- কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ । (সুরাঃ আন আনআম আয়াতঃ ১১১)

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ

- বরং তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে জানে না, অতএব তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (সুরাঃ আম্বিয়া আয়াতঃ ২৪)

তাছাড়া মানুষ শয়তানের দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় আর এজন্যই ঈমানদারের সংখ্যা কম থাকে ।

আল্লহ তাআলার মতে অল্প সংখ্যক লোকই নাযাত প্রাপ্ত । আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন যে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ

তোমরা সালাত প্রতিষ্টা করেব এবং যাকাত প্রদান করবে । অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে । তোমরাই অগ্রাহ্যকারী । (সুরাঃ বাকারা আয়াতঃ ৮৩)

অতএব অল্পসংখ্যক ব্যতিত তারা ঈমান আনবে না (সুরাঃ নিসা আয়াতঃ ৪৬)

আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকেই কৃতজ্ঞ । (সুরাঃ সাবা আয়াতঃ ১৩)

জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) নবী সাঃ থেকে বর্ণণা করেছেন, নবী সাঃ বলেছেন, মুসলিমদের থেকে অল্প সংখ্যক লোকই এই দ্বীনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে । (মুসলিম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ)

এমনটা ভাবা সঠিক নয় যে অধিকাংশ লোক সঠিক প্রাপ্ত এবং তাদের মত পথ পদ্ধতি কে মেনে নিলে সঠিক পথ পাওয়া যাবে বরং অল্প সংখ্যক লোকের মাঝেও সঠিক জ্ঞান বা পথ, মত, নীতি, যাই বলেন না কেন তা থাকতে পারে । আবার এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে, অধিকাংশরা সব সময় ভূল পথ প্রাপ্ত হয় বরং সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারে । তবে অধিকাংশের দোহাই দিয়ে মুশরিকদের নীতী, বিদাআত পালন করা যাবে না । এজন্য যে কোন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে প্রথমে সংখ্যাধিক্য না দেখে আল কুরআন এবং আল হাদিস কে প্রধান্য দিতে হবে ।

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ ۲ : ১৩ مُّسَمًّی ؕ

২. আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে।তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

--আয়াতের এক অনুবাদ উপরে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে কোন খুঁটি ব্যতীত উপরে উঠিয়েছেন, তোমরা সে আসমানসমূহকে দেখতে পাচ্ছ। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আসমানসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আসমানসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ। এ অর্থের স্বপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে পাই সেখানে বলা হয়েছে,

"আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় পৃথিবীর উপর তার অনুমতি ছাড়া।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৬৫] তবে আয়াতের অন্য এক অনুবাদ হলো, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অনুবাদটি ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি আকাশকে যমীনের উপর ছেড়ে দেন। না। যদি তার রহমত ও শক্তি তা না করত, তবে আসমান যমীনের উপর পড়ে যেত। ফলে এতে যা আছে তা ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা ধরে রাখতে পারে না। অবশ্যই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" [সূরা ফাতির: ৪১] [সা'দী]

--কুরআনুল কারীমের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوۡنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে

اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ کَیۡفَ خُلِقَتۡ ১৭ : ৮৮

وَ اِلَی السَّمَآءِ کَیۡفَ رُفِعَتۡ ১৮ : ৮৮

তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আসমানের দিকে, কিভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? [সূরা আল-গাশিয়াহঃ ১৭-১৮] বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এটা এসেছে যে, যমীনের আশেপাশে যা আছে যেমনঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রথম আসমান এ সবগুলোকে সবদিক থেকে সমভাবে বেষ্টন করে আছে।

এ আসমানসমূহকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোন প্রকার বাহ্যিক খুঁটি ব্যতীতই ধারন করে রেখেছেন। সেগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ে যাচ্ছেনা এটা একদিকে যেমন তাঁর মহা শক্তিধর ও ক্ষমতাবান হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে অন্যদিকে আসমান ও যমীন যে কত প্রকাণ্ড সৃষ্টি তার এক প্রচ্ছন্ন ধারণা আমাদেরকে দেয়। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ বলেন,

"মানুষকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" [সূরা গাফেরঃ ৫৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তার নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আত-তালাকঃ ১২]

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ،

'যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুলুম করে কেড়ে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে'। বুখারী হা/২৪৫২।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন

أَخَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا '...তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আসমানের রক্ষককে বললেন, দরজা খোল। তিনি বললেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রীল, আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ (ছাঃ)। তিনি আবার বললেন, তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তারপর আসমান খোলা হ'লে আমরা দুনিয়ার আসমানে (১ম আসমান) উঠলাম'। বুখারী হা/৩৪২।

এছাড়া ছহীহ মুসলিমে (হা/৩০৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে ১ম আসমানে আদম (আঃ), ২য় আসমানে ঈসা এবং ইয়াহইয়া (আঃ), ৩য় আসমানে ইউসুফ (আঃ), ৪র্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), ৫ম আসমানে হারুণ (আঃ), ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং ৭ম আসমানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় জিব্রীল (আঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর।

আল্লাহ বলেন, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، 'অতঃপর আকাশমন্ডলীকে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আকাশে তার নির্দেশ প্রেরণ করলেন। আর আমরা দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সুশোভিত করলাম এবং তাকে করলাম (দুনিয়ার জন্য) সুরক্ষা ছাদ স্বরূপ। বস্তুতঃ এটি হ'ল মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা' (ফুছছিলাত ৪১/১২)।

আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، 'যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাও কি?' (মূলক ৬৭/৩)।

---- আল্লাহ আরশের উপর উঠার ব্যাপারটি তাঁর একটি বিশেষ গুণ। তিনি আরশের উপর উঠেছেন বলে আমরা স্বীকৃতি দেব। কিন্তু কিভাবে তিনি তা করেছেন তা আমাদের জ্ঞানের বাইরের বিষয়। আরশের (অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল)

ওপর আল্লাহর সমাসীন হবার ব্যাপারটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানকে কেবল সৃষ্টিই করেননি বরং তিনি নিজেই এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন। এ সুবিশাল জগতটি এমন কোন কারখানা নয়, যা নিজে নিজেই চলছে, যেমন অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে। আর এ প্রাকৃতিক জগতটি বহু ইলাহর বিচরণক্ষেত্র নয়, অন্য এক দল অজ্ঞ ও মূর্খ যেমনটি মনে করে বসে আছে বরং এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সৃষ্টিকর্তা নিজেই এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

আল্লাহর কিতাবের সাতটি স্থানে আল্লাহ তাআলা সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি আরশের উপরে সমুন্নত।

সূরা আরাফঃ৫৪, সূরা ইউনূসঃ৩, সূরা রা'দঃ ২, সূরা ফুরকানঃ ৫৯, সূরা সাজদাঃ৫৪, সূরা হাদীদঃ ৪, সূরা ত্বাহাঃ ৫

প্রত্যেক স্থানেই মাত্র একটি শব্দ তথা استواء ইস্তিওয়া (সমুন্নত হওয়া) দ্বারা আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে استوى على العرش ''তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন''। ইস্তিওয়া শব্দটি এখানে আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। ইস্তিওয়া (সমুন্নত হওয়া) আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি কর্মগত সিফাত। এটি তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সুসাব্যস্ত। অন্যান্য সিফাতের মতই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এই সুউচ্চ সিফাতটি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে।

আরবদের ভাষায় চারটি শব্দের মাধ্যমে ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথাঃعلا وارتفع وصعد واستقر এই চারটি শব্দের প্রথম তিনটির অর্থ উপরে উঠলেন এবং সমুন্নত হলেন। চতুর্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্থির হলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত استواء শব্দের অর্থে সালাফদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এই চারটি অর্থের উপরেই। আসলে ঘুরেফিরে অর্থ একটিই। তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ৫ : ২০ সূরা ত্বাহা ৫নং আয়াতের এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে সমন্নত। সমুন্নত না লিখে শুধু 'উপরে' কথাটি লিখে বা বলে ছেড়ে দিলেও ভুল হবেনা। কিন্তু কোন ক্রমেই সমাসীন বলা চলবেনা। কারণ আরশের উপর আল্লাহ তাআলা কিভাবে সমুন্নত হয়েছেন, তার কোন ধরণ কুরআন ও সহীহ হাদীছে বলা হয়নি। এমনি আল্লাহর অন্য কোন সিফাতেরও ধরণ বলা যাবেনা। আল্লাহ যেমন, তাঁর সিফাতও তেমন। তাঁর পবিত্র সত্তার প্রকৃত অবস্থা আমরা যেমন জানিনা, তিনিই জানেন তেমনি তাঁর অন্য কোন সিফাতের প্রকৃত অবস্থাও আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর অনেক সিফাতে কামালিয়া রয়েছে, যা কোন মাখলুকের সিফাতের মত নয়। যদি সমাসীন বলা হয়, তাহলে আল্লাহর বিশেষ একটি অবস্থা (বসা) সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যা কোন দলীল বা সালাফদের উক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত আসমান ও এর ভিতরে যা আছে এবং এর মাঝখানে যা আছে তা সবই কুরসীর মধ্যে যেন বিস্তীর্ণ যমীনের মধ্যে একটি আংটি আর কুরসী হলো মহান আরশের মধ্যে তদ্রুপ একটি আংটি স্বরূপ যা এক বিস্তীর্ণ যমীনে পড়ে আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আরশ তার পরিমাণ তো মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করে বলতে পারবে না। [তাবারী]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

(إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ)

'আল্লাহ তা' আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর উক্ত ফয়সালার প্রতি অনুগত হয়ে তাদের পাখাসমূহ এমনভাবে নাড়াতে থাকেন যার ফলে শক্ত পাথরে শিকল দিয়ে প্রহার করলে যে ধরণের আওয়াজ হয় সে রকম আওয়াজ হতে থাকে' ' বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাফসীর।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم

‘তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষার দানা যেমন সামান্য স্থান দখল করে, সাত আসমান ও সাত যমীন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক তেমনই’ ’ ।

তিনি বলেন: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

অর্থ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা ১১)

--- র একটি অর্থ এই যে, ‘প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করবে।’ অর্থাৎ কিয়ামত অবধি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চলতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

অর্থাৎ, সূর্য তার স্থির হওয়ার সময় পর্যন্ত চলছে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন ৩৮)

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, চন্দ্র এবং সূর্য উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। সূর্য নিজের চক্র এক বছরে এবং চন্দ্র এক মাসে পূর্ণ করে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾

অর্থাৎ, চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন কক্ষপথ। (সূরা ইয়াসীন ৩৯)

সাতটি বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ রয়েছে, ওদের মধ্যে দু’টি হলো সূর্য এবং চন্দ্র। এখানে শুধু উক্ত দু’টি গ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, কেননা এ দুটিই (মানুষের চক্ষুদৃষ্টিতে) সর্বাধিক বিশাল এবং মহত্বপূর্ণ। এ দুটিও যখন আল্লাহর নির্দেশাধীন, তাহলে অন্যগুলো নিশ্চিতরূপে তাঁর নির্দেশাধীন হবে। আর যখন এরা আল্লাহর হুকুমের অধীনে, তখন এরা মা‘বূদ (উপাস্য) হতে পারে না। মা‘বূদ তো তিনিই, যিনি এদেরকে অধীনস্থ করে রেখেছেন।

তাই তিনি বলেন,﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করতে চাও। (সূরা ফুসসিলাত ৩৭)

অন্যত্র বলেন, ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। (সূরা আ‘রাফ ৫৪)

--- তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এর মানে, আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলী তিনি বর্ণনা করছেন। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তিনি বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করছেন যে, যিনি পূর্ব বর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] এগুলো আরও প্রমাণ করছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। [ইবন কাসীর]

---- ওপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাদের এ সাক্ষ্য তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহ আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ্যও এ নিদর্শনগুলোই দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ্য একটু অস্পষ্ট এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোধগম্য হয়। তাই প্রথম সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেবার প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। কারণ শ্রোতা শুধুমাত্র যুক্তি শুনেই বুঝতে পারে, এ থেকে কি কথা প্রমাণ হয়। তবে দ্বিতীয় সত্যটির ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে চিন্ত-ভাবনা করলেই নিজের রবের দরবারে হাযির হবার ব্যাপারটির ওপর বিশ্বাস জন্মাতে পারে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলো থেকে আখেরাতের প্রমাণ দু’ ভাবে পাওয়া যায়ঃ

একঃ যখন আমরা আকাশমণ্ডলীর গঠনাকৃতি এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একটি নিয়মের অধীনে পরিচালনা করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তখনই আমাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এ বিশাল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর অসীম শক্তি এ

বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রকে মহাশূন্যে আবর্তিত করছে তাঁর মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

দুইঃ এ মহাশূন্য ব্যবস্থা থেকে আমরা একথারও সাক্ষ্য লাভ করি যে, এর স্রষ্টা একজন সর্বজ্ঞ এ পরিপূর্ণ জ্ঞানবান সত্তা। তিনি মানব জাতিকে বুদ্ধিমান সচেতন এবং স্বাধীন চিন্তা কর্ম শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করার এবং নিজের যমীনের অসংখ্য বস্তুনিচয়ের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করার পর তাদের জীবনকালের বিভিন্ন কাজের হিসেব নেবেন না, তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদেরকে জুলুম-অত্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং মজলুমদের ফরিয়াদ শুনবেন না, তাদের সৎলোকদেরকে সৎকাজের পুরস্কার এবং অসৎলোকদেরকে অসৎকাজের জন্য শাস্তি দেবেন না এবং তাদেরকে কখনো জিজ্ঞেসই করবেন না যে, আমি তোমাদের হাতে যে মূল্যবান আমানত সোপর্দ করেছিলাম তাকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করেছো-একথা তাঁর পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে কখনো কল্পনাই করা যায় না। একজন অন্ধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজা অবশ্যি নিজের রাজ্যের যাবতীয় কাজ-কারবার নিজের কর্মচারীদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সচেতন রাজার কাছ থেকে কখনো এ ধরনের ভ্রান্তি, অসতর্কতা ও গাফলতি আশা করা যেতে পারে না।

আকাশ সম্পর্কে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলে পরকালীণ জীবন যে সম্ভবপর শুধু এ ধারণাই আমাদের মনে সৃষ্টি হয় না বরং তা যে একদিন অবশ্যি শুরু হবে এ ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

وَ هُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡهٰرًا ؕ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ ۱۳ : ৩
النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

পূর্বের আয়াতে উপরস্থিত আসমানের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন। আর এখানে নিচের বা যমীনের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সম্বোধন করে। বাহ্যদশী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পর্বত-শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

(২) অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলফসলের দু'প্রকার সৃষ্টি করছেনঃ লাল-হলুদ, টক-মিষ্টি। [বাগভী] তবে এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টি (زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ফলই দু' প্রকার হয়, রঙের দিক থেকে যেমন, সাদা-কালো, অথবা স্বাদের দিক থেকে যেমন, মিষ্টি-টক, অথবা আকৃতির দিক থেকে যেমন, বড়-ছোট, অথবা অবস্থাগত দিক থেকে যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, زَوۡجَیۡنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়া। [কুরতুবী]

(৩) আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে কালো করে দেয়া হয়। ফলে স্বচ্ছ শুভ্র উজ্জ্বল থাকার পর সেটা অন্ধকার কালোতে রূপান্তরিত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবার আরেক অর্থে, তিনি এ দু'টিকে এমন করেছেন যে, এর প্রত্যেকটি অপরটিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। [ইবন

কাসীর] একটি যাওয়ার সাথে সাথে আরেকটি আসবেই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাদের বাসস্থান যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন তেমনি তিনি সময়ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৪) উপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলোতে কেউ চিন্তাভাবনা করলে অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই আর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলো সবই সত্য। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

وَ فِى الۡاَرۡضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّ جَنّٰتٌ مِّنۡ اَعۡنَابٍ وَّ زَرۡعٌ وَّ نَخِيۡلٌ صِنۡوَانٌ وَّ غَيۡرُ صِنۡوَانٍ يُّسۡقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَ نُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلٰى بَعۡضٍ فِى الۡاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ১৩ : ৪

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড, আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল থেকে উদগত বা ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত খেজুর গাছ যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি।নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা নতুন করে অন্য আরেক প্রকার নিদর্শন পেশ করছেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ গুলোর কোনটি এমন যে, তাতে শস্য উৎপন্ন হয় আবার কোন কোনটি একেবারে অকেজো ভূমি যাতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয়না অথচ এ দু'ধরনের ভূমিই পাশাপাশি অবস্থিত। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমান জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। এ ভুখণ্ড লাল, অপরটি সাদা, কোনটি হলুদ, কোনটি মিহি, অথচ সবগুলোই পাশাপাশি। প্রতিটি তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাধর সত্তা রয়েছেন যিনি এগুলো করেছেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র রব, তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] তাছাড়া কোন কোন ভূমি পাশাপাশি নয় অথচ তাদের মধ্যে একই ধরণের শক্তি, যোগ্যতা পাওয়া যায়। এখানে পাশাপাশি নয় এ কথাটি উহ্য থাকতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দুটি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এতে একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সত্তার কার্য সক্রিয় আছে দেখতে পাবে। যিনি তার অসীম ক্ষমতায় এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা সবশেষে বলেছেন যে, নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন। [ইবন কাসীর]

(৪) বলা হচ্ছে, এই যে পরস্পর পাশাপাশি দুটি ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে একই ফল একই জমিতে একই পানি দ্বারা উৎপন্ন করি তারপরও সেটার স্বাদ দু'রকমের হয়। একটি মিষ্ট অপরটি টক। একটি অত্যন্ত উন্নতমানের অপরটি অনুন্নত পর্যায়ের। একটি চিত্তাকর্ষক অপরটি তেমন নয়। এসব কিছুতে কেউ চিন্তা, গবেষণা ও বিবেক খাটালে

যে কেউ অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এর বিভিন্নতার প্রকৃত কারণ এক মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, সাধারণত: যে কারণে ফল-ফলাদিতে পার্থক্য সূচিত হয় তা দুটি।

এক, উৎপন্নস্থানের ভিন্নতা, দুই পানির গড়মিল।

কিন্তু যদি জমি ও পানি একই প্রকার হয়, তারপর যদি সেটাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ফল পরিলক্ষিত হয় তবে বিবেকবান মাত্রই এটা বলতে বাধ্য হবে যে, এটা সেই অপার শক্তি ও আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

মুজাহিদ বলেন, এটা মূলত: আদম সন্তানদের জন্য একটি উদাহরণ, তাদের মধ্যে নেককার ও বদকার হয়েছে অথচ তাদের পিতা একজনই। হাসান বসরী বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের হৃদয়ের জন্য পেশ করেছেন। কারণ, যমীন মহান আল্লাহর হাতে একটি কাদামাটির পিণ্ড ছিল। তিনি সেটাকে বিছিয়ে দিলেন, ফলে সেটা পরস্পর পাশাপাশি টুকরায় পরিণত হলো, তারপর তাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তা থেকে বের হলো, ফুল, গাছ ফল ও উদ্ভিদ। আর এ মাটির কোনটি হল খারাপ, লবনাক্ত ও অস্বচ্ছ। অথচ এগুলো সবই একই পানি দিয়ে সিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষও আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আসমান থেকে তাদের জন্য স্মরণিকা (কিতাব) নাযিল হলো, কিছু অন্তর নরম হলো এবং বিনীত হলো, আর কিছু অন্তর কঠোর হলো এবং গাফেল হলো। হাসান বসরী বলেন, কুরআনের কাছে কেউ যখন বসে তখন সে সেখান থেকে বেশী বা কম কিছু না নিয়ে বের হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৮২] এতে অবশ্যই বিবেকবানদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। [বাগভী]

وَ اِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَ اِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَ اِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِکَ الۡاَغۡلٰلُ ১৩ : ৫
فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ

৫. আর যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথাঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব? এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে আর এরাই তারা, যাদের গলায় থাকবে শিকল। আর তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

এ আয়াত ও পরবর্তী দুটি আয়াতে কাফেরদের মৌলিক তিনটি সন্দেহ ও তার উত্তর দেয়া হয়েছে। সন্দেহগুলো হচ্ছে,

এক. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব কিতাব অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, "আর কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট!" (সূরা সাবাঃ ৭]

দুই. তাদের দ্বিতীয় সন্দেহটি হচ্ছে, যদি বাস্তবিকই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন?

তিন. কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন?

এ সন্দেহ তিনটির উত্তর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫ নং আয়াত এবং পরবর্তী ৬ ও ৭ নং আয়াতে প্রদান করেছেন।

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তার নিদর্শনাবলী ও তাঁর প্রমাণসমূহ দেখে তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম এটার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য, তারপর তারা স্বীকার করছে যে, তিনিই সবকিছু প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি যখন প্রথম সৃষ্টি করেছেন তখন তারা কিছুই ছিল না। এতকিছুর পরও যদি

কাফেররা প্রতিটি সৃষ্টিকে পুনর্জীবনের বিষয়টির উপর মিথ্যারোপ করে তবে আপনি অবশ্যই আশ্চর্য হবেন। কিন্তু তার চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী; ইবন কাসীর]

কুরআনুল কারীম এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। তবে যেটা অন্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেক সহজ। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুওয়াতের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়াত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী]

কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তার পক্ষে পুনবার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনবার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে? আল্লাহ বলেন,

"আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৩]

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন। মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়াত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিনকে অস্বীকার করা।

(৩) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার পরিণতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা এর মাধ্যমে তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। [ইবন কাসীর] কারণ, আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার নিয়ে আসা আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ। তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর। এজন্য তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(৪) দুনিয়াতে তারা যেহেতু কুফরী করেছে সেহেতু তাদেরকে আখেরাতে এর পরিণতি ভোগ করতেই হবে। আখেরাতে তাদের পরিণতি হচ্ছে, তাদের গলায় থাকবে শেকল পরানো। গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত। তাদের গলায় যে শেকল পরানো হবে তা হবে আগুনের শিকল। [মুয়াসসার] তাদেরকে তা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। [ইবন কাসীর]

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ১৩ : ৬

৬. আর তারা ভালোর পূর্বেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে। অথচ তাদের আগে শাস্তির অনুরূপ বহু (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। আর নিশ্চয় আপনার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে কঠোর।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল, যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলতে থাকেঃ "হে আমাদের রব! এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও। কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না।" [সূরা সোয়াদঃ ১৬]।

আবার কখনো বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্যি হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩২] আবার কখনো তারা রাসূলকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বলতে থাকেঃ "তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশতাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন? আমরা ফিরিশতাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া নাযিল করি না; ফিরিশতারা উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবে না।" [সূরা আল-হিজরঃ ৬-৮]

এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে।

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।" [সূরা আল-আনকাবুতঃ ৫৩-৫৪]

আরো এসেছে, "যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় [সূরা আশ-শূরাঃ ১৮]।

মোটকথাঃ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে। এটা ছিল তাদের অবিশ্বাস, কুফরি, অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির চরম পর্যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদেরকে এর মাধ্যমে আল্লাহ পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ, উপদেশ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় তাদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلة এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে, "মানুষের সীমালংঘন সত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল" । মানুষের শত অন্যায়কেও তিনি ক্ষমা করেন। যদি তিনি ক্ষমাশীল না হতেন তবে কারোই রেহাই ছিল না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

"আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ তো আছেন তার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ফাতিরঃ ৪৫]

আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যে শুধু ক্ষমাশীল তা-ই নয় বরং তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাকে আশা ও ভীতির মধ্যে রাখেন।

অতঃপর যদি তারা আপনার উপর মিথ্যারোপ করে, তবে বলুন, 'তোমাদের রব সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তার শাস্তি রদ করা হয় না। সূরা আল-আনআমঃ ১৪৭,

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ঘোষণা করেন যে অবশ্যই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। সূরা আল-আরাফঃ ১৬৭,

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ১৫ : ৪৯

وَ اَنَّ عَذَابِیۡ هُوَ الۡعَذَابُ الۡاَلِیۡمُ ১৫ : ৫০

আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দিয়ালু। আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি! সূরা আল-হিজরঃ ৪৯-৫০]

যাতে করে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে। শুধু আশার বাণী শুনতে শুনতে মানুষ সীমালঙ্ঘন করতে দ্বিধা করবে না। আবার শুধু ভয়-ভীতির কথা শুনতে শুনতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না। এটাই আল্লাহ তা'আলা চান। সে জন্য তিনি যখনই কোন আশার কথা শুনিয়েছেন সাথে সাথেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ আশা ও ভীতির মাঝেই হলো ঈমানের অবস্থান। [ইবন কাসীর]

وَ یَقُوۡلُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَوۡ لَاۤ اُنۡزِلَ عَلَیۡهِ اٰیَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُنۡذِرٌ وَّ لِکُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ ৭ : ১৩

৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলের কাছে বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রাসূল হবার উপর ঈমান আনতে পারে। এটা ছিল মূলতঃ তাদের গোঁড়ামী। যেমন এর পূর্বেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার অযথা আব্দার করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে, আপনি মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিন।সে পাহাড়ের জায়গায় নদী-নালার ব্যবস্থা করে দিন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৯] [ইবন কাসীর] মু'জিযা প্রকাশ করা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবী ও ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ) অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

(২) আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আর প্রতিটি কাওমের জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী নবী, যিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর]

দুই. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং প্রতিটি কাওমের জন্যও আপনি হিদায়াতকারী অর্থাৎ আহবানকারী। [বাগভী; ইবন কাসীর]

তিন. সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর সত্যিকার হিদায়াতকারী তো আল্লাহ তা'আলাই। [বাগভী; ইবন কাসীর]

প্রথম মতটিকে ইমাম শানকীতী প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এর সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল।" [সূরা ইউনুস: ৪৭]

আরও এসেছে, اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ ৩৫ : ২৪

"নিশ্চয় আমরা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী।" [সূরা ফাতির: ২৪]

আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।" [সূরা আন-নাহ্‌ল: ৩৬] [আদওয়াউল বায়ান]

অন্য সূরায় বলা হয়েছে, আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। [সূরা আন-নাহল: ৩৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে, আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি। যার জন্য সতর্ককারী ছিল না। [সূরা আশ-শূ'আরা: ২০৮]

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيۡهِمۡ وَ يُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ ۚ وَ اِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ৩: ১৬৪

১৬৪. আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল। সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪

ۚ وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوۡلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيۡقِيۡنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيۡنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيۡقًا ৪: ৬৯

৬৯. আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! সূরা আন নিসাঃ ৬৯